২০১৩ সালের ৫ মে শাপলা চত্বরের
নৃশংস গণহত্যার প্রামাণ্য প্রতিবেদন

ঢাকার কারবালা

ফায়যুর রাহমান

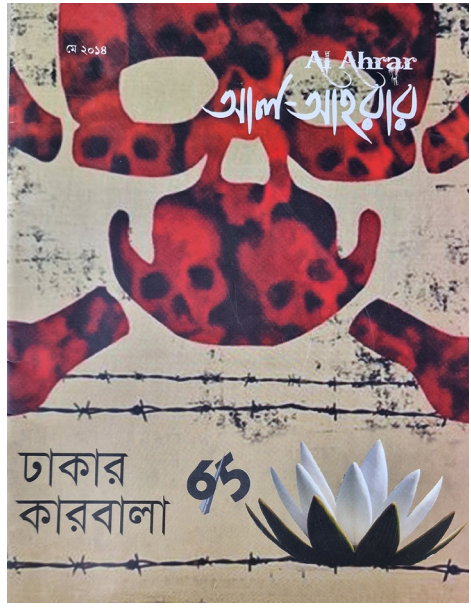

প্রতিবেদনটি যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত *আল আহরার*-এর মে ২০১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

ঢাকার কারবালা

ফায়যুর রাহমান

৫ মে ২০১৩, ঢাকা। ছবি : খুরশেদ রিংকু, *এপি*

২০১৩ সালের ৫ মে গভীর রাতে রাজধানী ঢাকার শাপলা চত্বরে হেফাজতের ইসলামের সমাবেশে তৎকালীন সরকারের চালানো নৃশংস গণহত্যার ঘটনার প্রথম বার্ষিকীতে (২০১৪) লন্ডন ভিত্তিক জনপ্রিয় মাসিক *আল আহরার* ম্যাগাজিন আমার একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেই সময়ে সরকারের সৃষ্ট ভয়ের পরিবেশের কারণে বাংলাদেশের কোনো পত্রিকা শাপলার প্রথম বার্ষিকীতে কোনো আয়োজন করতে পারেনি। এমনকি হেফাজতে ইসলামও হাটহাজারী মাদরাসায় দোয়া ছাড়া দেশের কোথাও কোনো কর্মসূচি পালন করতে পারেনি। সেই সময়ের একমাত্র প্রতিবেদন ছিল এটা।

ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে প্রতিবেদনটি পাঠকদের জন্য হুবহু তুলে ধরা হলো।

কারবালা ও বালাকোটের রক্তক্ষয়ী ঘটনার প্রতিচ্ছবি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঢাকার শাপলা চত্বর। ৬ মে ভোর রাতে শাপলা চত্বরের নৃশংস গণহত্যার পর থেকে বাংলাদেশের বাতাসে মজলুম মানুষের দীর্ঘশ্বাস জমা হচ্ছে। এ ঘটনায় এখনো শোকে-আতংকে নীরবে কাঁদছে দেশ। বাংলাদেশ এখন রাগ-শোক আতংক আর কান্নার দেশ। স্বজনহারা মানুষের হা-হুতাশ আর দীর্ঘশ্বাসের দেশ। শাপলা চত্বরের ঘটনা ইতিহাসের পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, কারবালা ও বালাকোট একবার নয়, বারবার ফিরে ফিরে আসে।

১৮২ বছর পূর্বে ঘটে যাওয়া বালাকোটের রক্তাক্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি যে শাপলা চত্বরে ঘটবে, কে জানতো! ইতিহাস তবুও তা-ই ঘটতে দিলো। ১৮৩১ সালের ৬ মে ফিরে এলো ২০১৩ সালের ৬ মে হয়ে। জায়গাটা ভিন্ন হলেও ঘটনায় কী অপূর্ব মিল! দু'টো ঘটনাই ঘটে ভোর রাতে। ১৮৩১ সালের ৬ মে ভোর রাতে বালাকোট প্রান্তরে সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও তাঁর কাফেলার বেশিরভাগ সদস্য ছিলেন তাহাজ্জুদরত, অনেকে ছিলেন ঘুমন্ত। এই অবস্থায় তাদের ওপর আক্রমণ শুরু হয়। তাহাজ্জুদরত অবস্থায় শহীদ হন সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও তাঁর সঙ্গীরা।
১৮২ বছর পরে আরেকটি ৬ মে ভোর রাতে শাপলা চত্বরে জিকির ও তাহাজ্জুদরত আলেম-ওলামা ও পীর মাশায়েখদের ওপর অভিযান চালানো হয়। শহীদের রক্তে লাল হয় শাপলা চত্বর। ইতিহাসে স্থান পায় আরেকটি নৃশংসতা।

বালাকোটের রক্তাক্ত ঘটনায় মুসলমানদের বিপক্ষে শিখনেতা শের সিং-এর বাহিনীর সেনাসংখ্যা ছিলো দশ হাজার। শাপলা চত্বরের ঘটনায়ও নিরস্ত্র-ঘুমন্ত আলেমদের ওপর হামলাকারী বাহিনীর সংখ্যা ছিলো দশ হাজার। বালাকোটের যিনি ছিলেন নেতা, তাঁর নাম সাইয়েদ আহমদ শহীদ। আর শাপলা চত্বরের যিনি নেতা, তাঁর নাম শাহ আহমদ শফী। বালাকোট ও শাপলা চত্বর- এ দু'টো ঘটনায় আক্রান্ত মুসলমানদের প্রতি চরম মিথ্যাচার ও বিষোদগার করা হয়েছে। বালাকোটের ঘটনার তিন যুগ পরে ব্রিটিশ সিভিলিয়ান উইলিয়াম হান্টার তার লেখায় সাইয়েদ আহমদ শহীদকে 'দস্যু ও ডাকাতসর্দার' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। আর শাপলা চত্বরের ঘটনার তিনদিন পরে সরকারের পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়, 'হেফাজতকর্মীরা বাংলাদেশ ব্যাংক ও সচিবালয়ে লুটপাট চালানোর নিশ্চিত তথ্য সরকারের হাতে ছিলো।'
শাপলা চত্বরের ঘটনা ইতিহাসের সিঁড়ি বেয়ে আমাদের নিয়ে যায় কারবালা

প্রান্তরে। যে শাপলা চত্বর সকালে ছিলো ঈদগাহ ময়দান, বিকেলে হয়ে গেলো কারবালা। সকালের উৎসবমুখর পরিবেশ বিকেলে রূপ নিলো কান্নায়।

৫ মে সকালবেলা স্রোতের মতো শহরে ঢুকছিলো তৌহিদী জনতা। ঢাকার সাধারণ মানুষও তাদের স্বাগত জানিয়েছিলো। তৃষ্ণার্ত মুসাফিরদের জন্য ঠান্ডা জল, শসা ও তরমুজ নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিলো গরীব ও মেহনতী মানুষেরা। স্কুলের ছোট ছোট বাচ্চারা রাস্তায় নেমে এসেছিলো ঈদের আনন্দে। দিগন্ত বিস্তৃত বিশ্বাসী মানুষের সারি দেখে মনে হয়েছিল

পুরো শহরটাই বুঝি একটা ঈদগাহ। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝা গেলো, এ কাফেলা কোনো ঈদগাহে নয়, ভুল করে এসে পড়েছে কারবালা প্রান্তরে। চারদিকে ইয়াজিদ বাহিনী ওঁত পেতে বসে আছে। দুপুরের মধ্যেই এই তৌহিদী জনতা নিজেদের অসহায়ত্ব টের পেলো। কিন্তু ওই যে ভদ্রলোকেরা, তারা বসে থাকবে কেন, শুরু করলো তান্ডব। প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো তৌহিদী জনতার মিছিলে।

দিনের শেষে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মুসাফিররা যখন ক্লান্ত, শরীর নেতিয়ে পড়েছে পথে, তখনই নেমে এলো সত্যিকার কারবালা। সন্ধ্যার আগেই নতুন ঈদগাহে লাশ হয়ে গেলো ১৫ জন। রাসুল (সা.) অবমাননার প্রতিবাদে জাতীয় পতাকা হাতে রাজধানীতে এসে নিরিহ আলেম-ওলামা ও মাদরাসার ছাত্ররা শিকার হলো নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডের।

যেভাবে শুরু

মহান আল্লাহ তাআলা ও তার প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কটুক্তি, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পর্নোগ্রাফি গল্পের প্রধান চরিত্র বানিয়ে এবং ইসলাম ধর্মকে বিকৃত করে বিভিন্ন ব্লগে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত ব্লগারদের শাস্তির দাবিতে ২০১৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে আন্দোলন করে আসছিলো হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ। ৬ এপ্রিল দেশের ৬৪ জেলা থেকে একযোগে রাজধানী ঢাকা অভিমুখে লংমার্চের ডাক দেয় সংগঠনটি। কিন্তু ৫ ও ৬ এপ্রিল দেশব্যাপি হরতাল ঘোষণা করে হেফাজতের লংমার্চ কর্মসূচিকে প্রতিরোধের ডাক দেয় সরকার সমর্থিত ২৯টি সংগঠন। 'নাশকতার' ভয়ে সারাদেশের রেল যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় সরকার। সরকারি চাপের মুখে আন্তঃজেলা রোটে বাস চলাচল বন্ধ করে দেয় পরিবহণ মালিক সমিতি। লংমার্চ 'প্রতিহত করার চক্রান্তের' প্রতিবাদে ৫ এপ্রিল বিকেল থেকে ৬ এপ্রিল সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাদেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা সদরে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে হেফাজতে ইসলাম। বিভিন্ন পাড়া-মহল্লা থেকে

হেফাজতকর্মীদের জন্য সাধারণ মানুষ মিছিল সহকারে খাবার ও পানীয় নিয়ে হাজির হন।

৬ এপ্রিল নানা বাধার মুখেও রাজধানীর শাপলা চত্বরে পনেরো থেকে বিশ লাখ মানুষ লংমার্চ-পরবর্তী সমাবেশে জমায়েত হন। ওই দিন বিকেলে লাখো মানুষের জনসমুদ্রে ১৩ দফা দাবি পেশ করে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ। সরকারকে একমাসের সময় দিয়ে ১৩ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে দেশজুড়ে মাসব্যাপি কর্মসূচিও ঘোষণা করা হয়। সর্বশেষ কর্মসূচি ছিলো ৫ মে, রাজধানী ঢাকা অবরোধ। কর্মসূচি অনুযায়ী ৪ মে থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হেফাজতে ইসলামের কর্মীরা ঢাকায় আসতে শুরু করেন। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ৫ মে ভোর থেকে রাজধানী ঢাকার প্রবেশমুখের ছয়টি পয়েন্টে অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন তারা।

সকালে ঢাকা

দু'-একদিন আগে থেকেই হেফাজতে ইসলামের কর্মীরা ঢাকা আসতে শুরু করলেও ৫ মে ভোর থেকে তারা রাজধানীর নির্ধারিত ছয়টি পয়েন্টে অবস্থান নিয়ে অবরোধ শুরু করেন। সকাল ১০ টার মধ্যেই রাজধানী অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। সবদিক দিয়ে ঢাকায় প্রবেশের পথ বন্ধ হয়ে পড়ে। যে ছয়টি পয়েন্টে হেফাজতকর্মীরা অবস্থান নেন, সেগুলো হচ্ছে- কাঁচপুর ব্রিজ থেকে যাত্রাবাড়ি, ডেমরা থেকে যাত্রাবাড়ি, পোস্তাগোলা ব্রিজের আগে ও পরে, বাবুবাজার ব্রিজ, আমিন বাজার ও টঙ্গী আব্দুল্লাহপুর। এই ছয়টি পয়েন্টে অবস্থান নিয়ে হেফাজতকর্মীরা ব্যানার-ফ্যাস্টুন নিয়ে, হাতে ও মাথায় জাতীয় পতাকা নিয়ে শ্লোগান দিতে থাকেন। কারো হাতে ও মাথায় কলিমা খচিত পতাকা দেখা যায়। বিভিন্ন স্থানে একাধিক মাইক ব্যবহার করে সমাবেশ চলতেও দেখা যায়। এসব সমাবেশে ১৩ দফা দাবি বাস্তবায়নের দাবিতে বক্তৃতা ও শ্লোগান দিতে দেখা যায়।

বৃষ্টির মধ্যেও অবস্থান চলে

ভোররাত থেকেই বৃষ্টি হতে থাকে। ফজরের নামাজের পর বৃষ্টি না থাকলেও একটু পরেই আবার ঝুম বৃষ্টি নেমে আসে। তখনও হেফাজতকর্মীরা মিছিলসহকারে এসে রাস্তায় অবস্থান করছিলেন। এ সময় বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে পথ চলতে দেখা যায় মিছিলকারীদের। অনেকে বৃষ্টির মধ্যে পতাকা হাতে রাস্তায় শুয়ে থাকতেও দেখা যায়।

ঢাকার রাস্তায় হেফাজত কর্মীদের উপর আক্রমণ করে পুলিশ, ৫ মে ২০১৩, ঢাকা। ছবি : সালমান মিয়া, *আলামি স্টক ফটো*

বুড়িগঙ্গার দুই সেতুতে

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী অবরোধ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে কেরানীগঞ্জ দিয়ে ঢাকায় প্রবেশের দুটি পয়েন্টে বিক্ষোভ সমাবেশ করে হেফাজতে ইসলাম। ফজরের নামাজের পর থেকে বুড়িগঙ্গা ২য় সেতু সংলগ্ন কদমতলি গোলচত্বর ও ১ম সেতু সংলগ্ন হাসনাবাদ এলাকায় জড়ো হতে থাকেন হেফাজতের নেতাকর্মীরা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেরানীগঞ্জের পাশাপাশি বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা, ফুরিদপুর, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, মুন্সিগঞ্জ, ঢাকার নবাবগঞ্জ ও দোহার উপজেলা থেকে হেফাজতের নেতাকর্মীরা সেতু দুটির কেরানীগঞ্জ প্রান্তে এসে অবস্থান নেন। লক্ষাধিক মানুষের সমাগমের ফলে সেতু দুটি দিয়ে সবধরণের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সড়ক পথে এ সময় রাজধানীর সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন
হয়ে পড়ে।

কাঁচপুর এলাকায়

ভোর থেকেই হেফাজত কর্মীরা কাঁচপুর এলাকায় অবরোধ শুরু করেন। এতে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-সিলেটসহ ওই অঞ্চলের সঙ্গে রাজধানীর সড়ক

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ সময় হেফাজতকর্মীরা জাতীয় পতাকা হাতে ১৩ দফা দাবির পক্ষে শ্লোগান দেন। সকালে ছাত্রলীগের কর্মীরা একটি মিছিল নিয়ে কাঁচপুর এলাকায় এসে হেফাজতকর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে হেফাজতের অন্তত বিশজন কর্মী আহত হন। সকাল সোয়া নয়টার দিকে কাঁচপুর এলাকার কয়েকটি গার্মেন্টস শ্রমিকরা বের হয়ে এসে হেফাজতে ইসলামের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে ছাত্রলীগ কর্মীদের ধাওয়া করেন। এতে তারা পালিয়ে যায়।

গাজীপুর চৌরাস্তায়

ভোর ছয়টা থেকে হেফাজতে ইসলামের কর্মীরা টঙ্গী ব্রিজের কাছে জড়ো হতে থাকেন। প্রতি মুহূর্তে জনসমাগম বাড়তে থাকে। মাত্র একটা ঘন্টা সময়ের ব্যবধানে জনসমাগম ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণে বিমানবন্দর থেকে উত্তরে চেরাগ আলি পর্যন্ত। তখন লাখ লাখ হেফাজতকর্মীর হাতে পতাকা, কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ, কারো মাথায় কালেমা খচিত পতাকা, কারো লাটির মাথায় জাতীয় পতাকা দেখা যায়।

ফজরের নামাজের পরই ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ঢাকার প্রবেশপথ গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে আব্দুল্লাহপুর পর্যন্ত অবরোধ করে রাখেন হেফাজতকর্মীরা। এ সময় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের গাজিপুর কোনাবাড়ি, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বোগড়া বাইপাস, বাসন সড়ক, বোর্ডবাজার এলাকায় ছিলো লাখো মানুষের স্রোত।

টঙ্গী থেকে দক্ষিণে বিমানবন্দর, উত্তরে ভোগড়া বাইপাস, পূর্বে আমতলি, পশ্চিমে কামারপাড়া সড়ক পর্যন্ত ছিলো লাখো মানুষের ঢল।

গাবতলী-হেমায়েতপুর সড়কে

লাখো মানুষের শ্লোগানে মুখরিত ছিলো গাবতলীর মাজার রোড থেকে সাভারের হেমায়েতপুর পর্যন্ত মহাসড়কটি। তারা এসেছিলেন জাতীয় পতাকা ও কালেমা খচিত পতাকা হাতে। ফজরের নামাজের পরই মহাসড়কের নিয়ন্ত্রণ নেন তারা। এ সময় কেউ দাঁড়িয়ে কেউ বসে প্রতিবাদী শ্লোগান দিতে থাকেন মহানবী (স.) অবমাননার। থেমে থেমে খন্ড খন্ড মিছিল করতে থাকেন মহাসড়কে। কর্মীদের উদ্দীপ্ত করতে গাওয়া হয় ইসলামি গজল।

ভ্রাম্যমান কাভার্ড ভ্যানে রাজপথে সঙ্গীত পরিবেশন করেন ইসলামী সঙ্গীতশিল্পীরা। এ সময় ১৩ দফার সমর্থনে শ্লোগান দিতে দেখা যায় লাখ লাখ জনতাকে।

আমিন বাজার ও আব্দুল্লাহপুর

ভোর থেকে রাজধানীর প্রবেশমুখ ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভারের বলিয়ারপুর থেকে আমিন বাজার ও আব্দুল্লাহপুর বাইপাইল সড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ শুরু করে হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীরা। এ সময় হাজার হাজার হেফাজতকর্মী সড়ক দু'টি ব্যারিকেড দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেন। ফজরের নামাজের পরই তারা আমিন বাজার ও আশুলিয়া বাজারসহ আব্দুল্লাহপুর এসে জড়ো হতে থাকেন।

তাদের হাতে ছিলো জাতীয় পতাকা ও বিভিন্ন শ্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড। তারা ১৩ দফার সমর্থনে মিছিল সমাবেশ করেন সেখানে।

রাজধানীতে প্রবেশ

দুপুরে তারা অবরোধ কর্মসূচি গুটিয়ে রাজধানীর বায়তুল মোকাররম এলাকায় হেফাজতে ইসলামের আমীর আল্লামা শাহ আহমদ শফীর নেতৃত্বে দোয়া কর্মসূচি পালনের জন্য শহরে প্রবেশ করতে শুরু করেন। কিন্তু বায়তুল মোকাররমে সমাবেশের অনুমতি না দিয়ে বেলা তিনটার দিকে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে সমাবেশের অনুমতি দেয় ঢাকা মেট্রপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। এরপর জনস্রোত শাপলা চত্বর অভিমুখে প্রবাহিত হতে থাকে। কিন্তু ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ অফিসের সমুখ দিয়ে শাপলা চত্বরে আসার সময় হেফাজতকর্মীদের ওপর সরকারদলীয় কর্মীসমর্থকরা স্বশস্ত্র হামলা চালায়। এতে হেফাজতকর্মী ও সরকারদলীয় কর্মীসমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সংঘর্ষ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে পল্টন, বায়তুল মোকাররম, বিজয় নগর, ফকিরাপুল থেকে বাংলা মোড় পর্যন্ত। এ সময় পুলিশও সরকারদলীয় কর্মীদের সহায়তা করে। পুলিশের মুহুর্মুহু গুলির শব্দে চারদিক প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। আতংকিত হেফাজতকর্মীরা প্রাণ রক্ষার জন্য বিভিন্ন ভবনের দেয়ালের ভিতর আশ্রয় নেন। সংঘর্ষে পুলিশের গুলি ও সরকারদলীয় কর্মীসমর্থকদের হামলায় তিনজন হেফাজতকর্মী মারা যান। আহত হন কয়েক শত। তবু সংঘর্ষ চলতে থাকে। দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত।

সকাল নয়টার দিকে যাত্রাবাড়ি থেকে একটি মিছিল মতিঝিল আসার কালে বঙ্গভবন এলাকায় পুলিশ তাদের বাধা দেয়। সকালে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় এখান থেকেই। এরপর দিনভর বিভিন্ন এলাকায় চলে সংঘর্ষ। বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে দিনভর পেটানো হয় সমাবেশে

আসতে থাকা হেফাজতকর্মীদের। অনেক হেফাজতকর্মীকে টেনে হিচড়ে অফিসের ভিতর নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে তাদের ভাগ্যে কী ঘটেছিলো তা আর জানা যায় নি।

সরকারদলীয় ক্যাডারদের হামলা ও পুলিশের মুহুর্মুহু গুলিতে পল্টন-বায়তুল মোকাররম এলাকায় একটা যুদ্ধাবস্থা তৈরি হয়। রাত আটটা পর্যন্ত ওই এলাকায় টানা সংঘর্ষ চলে। এরপর হেফাজতকর্মীরা পিছু হটে দৈনিক বাংলা পর্যন্ত চলে যান। তখনো পুলিশ থেমে থেমে গুলি-টিয়ারসেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করছিলো। রাত দশটার দিকে হেফাজতকর্মীরা সিটি সেন্টার পর্যন্ত হটে যান। তখনো বক চত্বর পর্যন্ত ছিলো তাদের দখলে। হঠাৎ করে র‍্যাব-পুলিশ-বিজিবি সদস্যরা গুলি করতে করতে এগিয়ে আসে। হেফাজতকর্মীরা আতংকে আবারো পিছু হটতে থাকেন। এ সুযোগে পুলিশ-র‍্যাব সদস্যরা মতিঝিল থানার সামনে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে।

আশরাফের হুশিয়ারি

দুপুর তিনটার দিকে শাপলা চত্বরে সমাবেশ শুরু হয়। হেফাজতে ইসলামের নেতারা পর্যায়ক্রমে সেখানে তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে বক্তৃতা দিতে থাকেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মিডিয়ায় সমাবেশের খবর সম্প্রচার হতে থাকে। দুপুরের পর সংবাদ সম্মেলন করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফ হেফাজতকে উদ্দেশ্য করে বলেন, সন্ধ্যার মধ্যে রাজধানী ছেড়ে চলে যাও, নয়তো এ্যাকশনের জন্য তৈরি হও।

পলাশীর মোড় থেকে ফিরিয়ে দেয়া হয় আল্লামা শফিকে

বিকেলে হেফাজতে ইসলামের আমীর আহমদ শফীর বক্তব্য ও মোনাজাতের মাধ্যমে সমাবেশ শেষ হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু পথে পল্টন ও বিজয়নগর এলাকায় সংঘর্ষের ফলে নিরাপত্তার অজুহাতে তাকে রাজধানীর লালবাগ থেকে শাপলা চত্বরে আসতে বাধা দেয় পুলিশ। সারা দিনের অজস্র সংঘাতের পর একমাত্র শফির পক্ষেই সম্ভব ছিলো কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘোষণা দেওয়া। কিন্তু পলাশি মোড় থেকে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। দিনভর চেষ্টা করেও তিনি লালবাগের অস্থায়ী কার্যালয় থেকে বের হতে পারেন নি। সন্ধ্যায় পুলিশ প্রটেকশনে তাকে সমাবেশে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হলে তাও ব্যর্থ হয়।
আইনশৃংখলা বাহিনীর একটি বিশেষ সংস্থার কারণে তিনি সমাবেশে যেতে পারেন নি বলে জানা যায়। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় তাকে পলিশের একটি গাড়িতে

তোলা হয়। এ সময় পুলিশের উপকমিশনার হুরুন অর রশিদসহ পোশাকি ও সাদা পোশাকি অনেক পুলিশ সদস্য সঙ্গে ছিলেন।
গাড়িটি পলাশি মোড়ে পৌছলে আইন প্রয়োগকারী একটি সংস্থার কয়েকজন সদস্য নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে ফিরিয়ে দেন।

অবস্থান ও অভিযান

শাপলা চত্বরের সমাবেশের লাখ লাখ জনতা আহমদ শফীর অপেক্ষা করছিলেন। এই অপেক্ষার মধ্যেই তারা রাস্তায় আছর ও মাগরিবের নামাজ আদায় করেন। এদিকে সমাবেশে আসার পথে পুলিশ ও সরকারদলীয় সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে নিহতদের লাশ একে একে সমাবেশস্থলে আসতে শুরু ও করে। তখন সমাবেশে চরম উত্তেজনা দেখা দেয়। পুলিশ ও সরকারদলীয় সমর্থকদের হামলায় অনেকে আহত ও নিহত হওয়ার ফলে হেফাজতে ইসলামের নেতারা অনড় অবস্থানে চলে যান। সন্ধ্যা সাতটার দিকে হেফাজত মহাসচিব আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী আল্লামা আহমদ শফী মতিঝিলে এসে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থানের ঘোষণা দেন। এ ঘোষণার সাথে সাথে মতিঝিল এলাকার রাস্তার বৈদ্যুতিক বাতিগুলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। অন্ধকারের মধ্যেও হেফাজতের নেতারা বক্তৃতা রাখছিলেন।

এদিকে পল্টন-বিজয়নগর-বায়তুল মোকাররম ও বাংলামোড় এলাকায় তখনো পুলিশের সঙ্গে হেফাজতকর্মীদের সংঘর্ষ চলছিলো। গুলি ও সাউন্ড গ্রেনেডের মুহুর্মুহু শব্দ সমাবেশস্থল থেকে শোনা যাচ্ছিলো। দূরে আগুনের লেলিহান শিখাও দেখা যাচ্ছিলো। টিয়ার সেলের গন্ধ এসে নাকে লাগছিলো। সমাবেশস্থলে একটা ভীতিকর অবস্থা বিরাজ করছিলো। ভুতূড়ে অন্ধকারের মধ্যে সমাবেশে তখন জিকির চলছিলো। কর্মীদের উজ্জীবিত রাখতে মাঝেমধ্যে শ্লোগানও দেওয়া হচ্ছিলো। রাত আটটার দিকে গুলির শব্দ আরো নিকটে শোনা গেলো। পুলিশ তখন গুলি টিয়ারসেল ছুঁড়তে ছুঁড়তে সমাবেশস্থলের দিকে আসছিলো। বাংলা মোড় থেকে পুলিশ ও বিজিবির সদস্যরা মতিঝিল থানার সামনে চলে এলে সমাবেশের শেষ প্রান্তের জনতা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এ সময় হেফাজতকর্মীদের লক্ষ করে গুলি ছুঁড়ে পুলিশ-বিজিবি। প্রত্যক্ষদর্শী হেফাজতকর্মীদের বর্ণনা অনুযায়ী এ সময় সাতজন হেফাজতকর্মী নিহত হন। হেফাজতের নেতারা তখন মাইকে পুলিশকে আর গুলি না করার অনুরোধ করছিলেন।

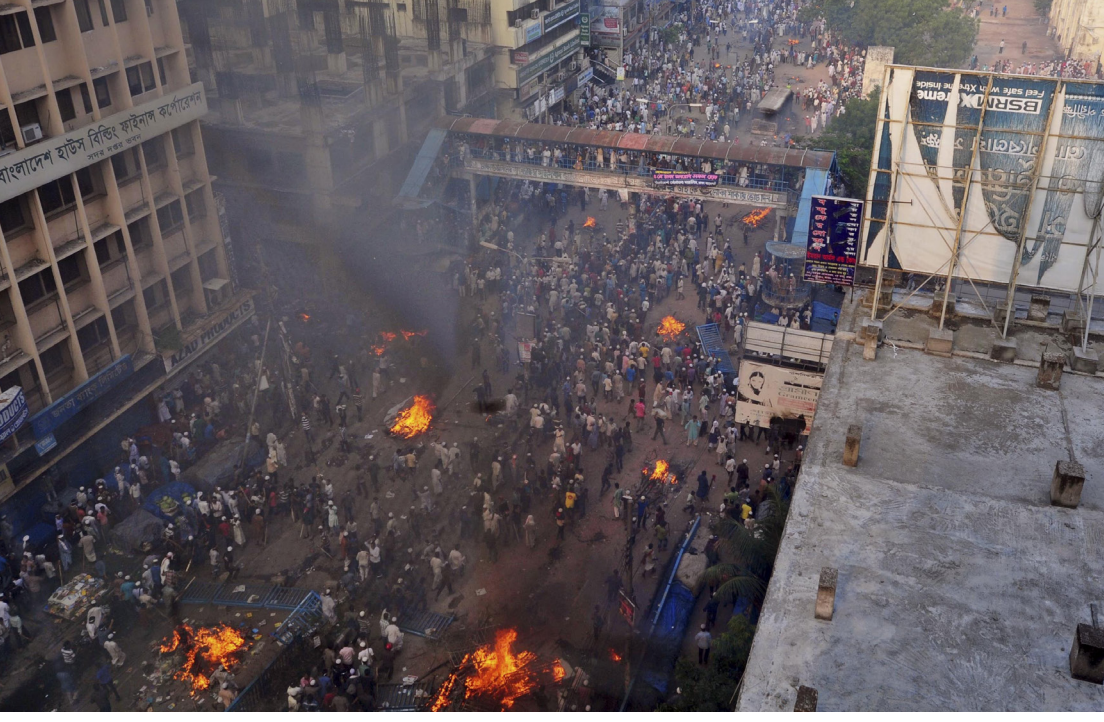

ঢাকার রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন হেফাজতের নেতা-কর্মীরা। ৫ মে ২০১৩, ঢাকা। ছবি : ইসমাইল ফেরদৌস, *এপি*

পুলিশ-বিজিবির গুলির মুখে আতংকিত হেফাজতকর্মীরা বাংলামোড় ও মতিঝিল থানার দিক থেকে ক্রমাগত সমাবেশের মঞ্চের দিকে সরে আসছিলেন। মঞ্চের সামনের চত্বরটি তখন লাখ লাখ মানুষের চাপ সামলাতে পারছিলো না। এ সময় অনেকেই পদপিষ্ট হচ্ছিলেন। লাখো মানুষের ভীড়ে কেউ পদপিষ্ট হলে সহজে ওঠাও সম্ভব হচ্ছিলো না। এ সময় কয়েকজন কিশোরকে পদপিষ্ট হয়ে রাস্তায় নিথর পড়ে থাকতে দেখো গেছে। পদপিষ্ট একজনকে দেখা গেছে যার হাঁটুর জোড়া আলগা হয়ে গেছে।

রাত আটটার পর থেকে পুলিশ হেডকোর্টারসহ কয়েকটি স্থানে দফায় দফায় বৈঠক হয়। কীভাবে হেফাজতে ইসলামকে মতিঝিল থেকে হটিয়ে দেওয়া যায়, সে বিষয়ে রণকৌশল ঠিক করা হয়। অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরেই দৈনিক বাংলা, মতিঝিল ও আরামবাগ এলাকায় এলাকায় বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। রাস্তার বাতিগুলোও নিভিয়ে দেওয়া হয়। চারপাশের ভূতুড়ে অন্ধকারে তখন হেফাজতকর্মীদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় অনেকে চলে যেতে চাইলেও পথে পথে দাঁড়িয়ে থাকা সরকারদলীয় সশস্ত্র ক্যাডারদের হাতে মারা পড়ায় ভয়ে তারা সমাবেশ থেকে বের না হওয়া নিরাপধ মনে করেন।

রাত এগারোটার দিকে শাপলা চত্বরের পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়ে আসে। পুলিশ-বিজিবি গুলি ও টিয়ারসেল ছুঁড়া বন্ধ করে। সমাবেশে আবারো বক্তৃতা ও সঙ্গীত চলতে থাকে। সমাবেশের জনতা আবারো বাংলামোড় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

রাতের গভীরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হেফাজতের কর্মীরা যে-যেখানে ছিলেন, সেখানেই বসে পড়েন। অনেকে গায়ের পাঞ্জাবি খুলে অথবা সঙ্গে থাকা ব্যাগ কিংবা জুতা কাপড়ে পেঁচিয়ে মাথার নিচে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। অনেকে সেখানে নামাজ ও জিকির করতে থাকেন।

রাত সাড়ে ১২ টার দিকে মতিঝিলের রাস্তার প্রতিটি বৈদ্যুতিক বাতি নিভিয়ে দিয়ে চারদিক অন্ধকার করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন পয়েন্টে সমাবেশের জন্য ব্যবহৃত মাইকের সংযোগও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, যাতে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে থাকা হেফাজতকর্মীরা মঞ্চের নির্দেশনা শুনতে না পান। পুলিশ, র‍্যাব, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন ও বিজিবির সমন্বয়ে গঠিত যৌথ বাহিনীর সদস্যরা পরিকল্পিতভাবে আর কে মিশন রোডটি বাদ দিয়ে তিনটি দলে ভাগ হয়ে শাপলা চত্বরে একযোগে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। দৈনিক বাংলামোড় থেকে একটি, ফকিরাপুল মোড় থেকে একটি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সমুখ হয়ে মূল মঞ্চের দিকে একটি- এই তিনটি দলে ভাগ হয়ে একযোগে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত হয়। আর কে মিশন রোড দিয়ে অভিযান না চালানোর উদ্দেশ্য ছিলো আহত ও বেঁচে যাওয়া হেফাজতকর্মীরা যাতে এ রোড দিয়ে পালিয়ে রাজধানীর বাইরে চলে যেতে পারে।

রাত আড়াইটার দিকে যৌথ বাহিনীর দশ হাজার সদস্য তিন দিক থেকে পরিকল্পিতভাবে শাপলা চত্বর ও আশপাশের এলাকায় থাকা নিরস্ত্র ঘুমন্ত ও জিকিররত হেফাজতকর্মীদের ওপর সাঁজোয়া যান ও মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্বিচারে গুলি, টিয়ারসেল, সাউন্ড গ্রেনেড, কাঁদানে গ্যাস ও গরম পানি ছুঁড়তে থাকে। যৌথ বাহিনী এ অভিযানের তিনটি সাংকেতিক নাম ব্যবহার করে। পুলিশের পক্ষ থেকে নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন সিকিউরড শাপলা', র‍্যাবের পক্ষ থেকে বলা হয় 'অপারেশন ফ্লাশ আউট', আর বিজিবির পক্ষ থেকে বলা হয় 'অপারেশন ক্যাপচার শাপলা'। রাতের এই অভিযানের বীভৎসরূপ যাতে প্রকাশিত না হয়, সে জন্য আগেই বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।

পরে, অভিযান চলাকালে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো দিগন্ত টিভি ও ইসলামিক টিভি নামের দু'টি টেলিভিশন চ্যানেল। এ দু'টি চ্যানেল শাপলা চত্বরের সমাবেশ সরাসরি সম্প্রচার করছিলো।

বেশিরভাগ সদস্য ছিলেন ঘুমন্ত

৬ মে ভোর রাতে যখন শাপলা চত্বরে অভিযান চালানো হয়, হেফাজতে ইসলামের বেশিরভাগ সদস্য ছিলেন তখন ঘুমন্ত। বাকিরা ছিলেন জিকিররত ও তাহাজ্জুদের নামাজরত। ফলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান প্রতিরোধের তেমন চেষ্টা তারা করতে পারেনি। গোলাগুলির শব্দে ঘুম ভাঙার পর অনেকে প্রাণভয়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। অনেকে হতাহত হন। এ সময় পালিয়ে আসা কয়েকজন জানান,

তারা অসংখ্য মানুষকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেছেন। তবে তাদের মধ্যে কতজন মারা গেছেন, তা বলতে পারেন নি তারা।

অভিযোগ উঠেছে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ট্রাক ও কাবার্ড ভ্যানে ওইসব লাশ রাতের অন্ধকারে সরিয়ে ফেলেছে। হেফাজতকর্মীরা জানিয়েছেন, আগের দিন চার-পাঁচশো মাইল জার্নি করে ও পরের দিন ২৫-৩০ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে মতিঝিলে আসায় অনেকেই ছিলেন ক্লান্ত। রাত এগারোটার পর অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েন। সারাদিনের ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে তাদের চোখ বুজে আসছিলো। ফলে রাস্তায় ও ফুটপাতে শুয়ে পড়েন তারা। দৈনিক বাংলামোড়ের যে স্থান থেকে পুলিশের গুলি-টিয়ারসেল ও সাইন্ড গ্রেনেড মারা শুরু হয়, সেই স্থানেও অনেকে ঘুমিয়ে ছিলেন। আরামবাগ পুলিশবক্স থেকে শুরু করে ইত্তেফাক মোড়, অপরদিকে দৈনিক বাংলামোড় ও দিলকুশার বিভিন্ন ফুটপাত, অফিসের বারান্দা ও সিঁড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন হাজার হাজার মানুষ। রাত আড়াইটায় যখন তিন দিক থেকে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ শুরু হয়, তখন হঠাৎ ঘুম ভাঙা আতংকিত মানুষেরা দিশেহারা হয়ে দিগ্বিদিক ছুটতে থাকেন। তখন অনেকে পদপিষ্ট হন। এ সময় শাপলার নিচের পানিতে ঝাপ দিয়ে কেউ কেউ আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। পুলিশ খুঁজে খুঁজে সেখান থেকে তাদের বের করে এনে বেদড়ক পেটাতে থাকে।

হতাহতদের কোনো পরিসংখ্যান নেই

প্রত্যক্ষদর্শী হেফাজতকর্মীদের ভাষ্যমতে অভিযানে নিহতের সংখ্যা শত শত হওয়ার আশংকা। সংবাদপত্রে পাঠানো হেফাজতের বিবৃতি দাবি করা হয়, ৫ মে দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত পল্টন, গুলিস্তান ও বিজয়নগর এলাকাতেই শুধু

ঢাকার শাপলা চত্বরে হেফাজতের ঐতিহাসিক সমাবেশে ছিলো লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ মানুষের উপস্থিতি, ৫ মে ২০১৩, ঢাকা। ছবি : *এএফপি*

পনেরোজনকে শহীদ করা হয়েছে। এদের
মৃতদেহের কয়েকটি পাশের দুটি হাসপাতালে পাওয়া গেছে। কয়েকটি লাশ সমাবেশস্থলে আনা গেছে। কয়েকটি গুম হয়ে গেছে। অভিযানের সময় তোলা কয়েকটি ভিডিওচিত্রের বরাত দিয়ে হেফাজত ইসলাম দাবি করে, শাপলা চত্বর সংলগ্ন সোনালী ব্যাংকের সিঁড়ি ও বারান্দায় ও কালভার্ট রোড ও তদসংলগ্ন গলি থেকে তোলা ভিডিওচিত্রে অন্তত বিশটি লাশ চিহ্নিত করা গেছে। ফলে পুরো এলাকায় যে শত শত মানুষকে শহীদ করা হয়েছে, সেটা তারা সহজেই অনুমান করতে পারছেন।

হেফাজতের প্রেসরিলিজে দাবি করা হয়, রাতের অভিযানে ঠান্ডা মাথায় ঘুমন্ত, জিকিররত ও নামাজরত আলেম-উলামা ও তৌহিদী জনতার ওপর নির্মম আক্রমণ করে শত শত লোককে নিহত করা হয়েছে। বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়, শাপলা চত্বরে সহস্রাধিক আলেম-ওলামাকে গণহত্যা করা হয়েছে। লাশ গুম করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের একটি বিবৃতিতে বলা হয়, হেফাজতে ইসলামের কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে ১১জনের মৃত্যু হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, শাপরা চত্বরে ৫০ জন নিহত হয়েছে। এশিয়ান হিউম্যান রাইটস বলেছে, নিহতের সংখ্যা আড়াই

হাজার হতে পারে। আলজাজিরা টেলিভিশন নিহতদের লাশ গোপনে সরিয়ে ফেলা নিয়ে একটি প্রতিবেদন করেছে। তারা ঢাকার জুরাইন কবরস্থানের গোরখোদক মূক ও বধির আব্দুল জলিলের ইশারা-ইঙ্গিতের একটি ইন্টারভিউ প্রকাশ করে। তাতে জলিল জানায়, হেফাজতের অভিযানের রাতে সে ১৪টি লাশ দাফন করেছে। যাদের দাড়ি ছিলো, শরীরে বন্দুকের গুলির চিহ্ন ছিলো। সরেজমিনে থাকা সাংবাদিকদের বরাত দিয়ে ইনকিলাব জানায়, পুলিশের নির্বিচার গুলিতে শত শত মানুষ হতাহত হয়েছেন। বহু লোককে রাস্তার পাশে নিথর পড়ে থাকতে দেখা গেছে। লাশগুলি অন্ধকারে পুলিশ তুলে নিয়ে গেছে। নিহতদের রক্তাক্ত নিথর দেহ পড়ে থাকায় বিভিন্ন স্থানে রক্তের দাগ লেপ্টে থাকে। বিভিন্ন স্থানে মাংসের টুকরাও পড়ে থাকতে দেখা যায়। অনেক লাশ ময়লার গাড়িসহ অন্যান্য গাড়িতে করে সরিয়ে ফেলা হয়।

হেফাজতকর্মীরা শাপলা চত্বর ছেড়ে যাওয়ার পর দমকল বাহিনী চত্বরটি ধোয়ামোছার কাজ করে। সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নকর্মীরাও মতিঝিল-দিলকুশা এলাকা পরিস্কার করে। অভিযানের পর মতিঝিল, দৈনিক বাংলা, ফকিরাপুল, আরামবাগ, ইত্তেফাক-ইনকিলাব মোড়সহ আশপাশের এলাকা এক নারকীয় বধ্যভূমিতে পরিণত হয়। ইনকিলাব জানায়, অভিযানের আগে বিপুলসংখ্যক ট্রাক আনা হয়। সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন কর্মীদের অপেক্ষমাণ রাখা হয়। এরা অভিযানের পরেই বিভিন্ন ধরণের আলামত ও হতাহতদের রক্তের দাগ পরিস্কার করতে শুরু করে। ফকিরাপুলের একটি আবাসিক হোটেলের ম্যানেজারের বরাত দিয়ে ইনকিলাব জানায়, অভিযানের রাতে ওই ম্যানেজার সারারাত হোটেল ভবনের ছাদে বসে ছিলেন। অভিযানের পরই তিনি ট্রাকে করে নীল পলিথিনে ঢেকে ট্রাকভর্তি লাশ নিয়ে যেতে দেখেছেন।

৬ মে নারায়নগঞ্জ ও চট্টগ্রামসহ আরো কয়েকটি স্থানে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে আরো ২৮জন মারা যান। ভোর রাতে শাপলা চত্বর থেকে হেফাজতের কর্মীরা পিছু হটে যাত্রাবাড়ি ও কাচপুর এলাকায় গিয়ে কয়েকটি মাদরাসায় অবস্থান নেন। ফজরের নামাজের পর তারা শাপলা চত্বর থেকে বলপ্রয়োগ করে সরিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে প্রথমে কাচপুর এলাকায় রাস্তা অবরোধ করেন। তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ-র‍্যাব-বিজিবি সদস্যরা চায়নিজ রাইফেলের গুলি, রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারসেল নিক্ষেপ করতে থাকলে হেফাজতের কর্মীদের সাথে সংঘর্ষ বেধে যায়। সংঘর্ষ ধীরে ধীরে কাচপুর থেকে সিদ্ধিরগঞ্জ, সানারপাড়, মৌচাক, সাইনবোর্ড ও মিরশরাইলে প্রায় তিন কিলোমিটার এলাকা

জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। যৌথ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে এ সময় অন্তত ১৮ জন মারা যান। ভোর ছয়টার দিকে বিপুলসংখ্যক র‍্যাব-পুলিশ-বিজিবির সদস্যরা মাদানীনগর মাদরাসায় অভিযান চালানোর চেষ্টা করে।
পুলিশের ধারণা ছিলো, এ মাদরাসায় বিপুল সংখ্যক হেফাজতকর্মীরা জড়ো রয়েছে। একই সময়ে আওয়ামী লীগের লোকজনও পুলিশের সঙ্গে লাঠিসোটা নিয়ে মাদরাসায় প্রবেশের চেষ্টা করছিলো। যৌথবাহিনী মাদরাসায় হামলা করেছে- এ খবর ছড়িয়ে পড়লে মাদানীনগর এলাকা থেকে শত শত মানুষ লাঠিসোটা নিয়ে যৌথবাহিনীর উপর পাল্টা আক্রমণ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে যৌথবাহিনী
বৃষ্টির মতো শত শত রাউন্ড টিয়ার সেল বৃষ্টির মতো শত শত রাউন্ড টিয়ার সেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। পুলিশ ও র‍্যাবের কয়েক দফা মাদরাসায় অভিযানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

সকাল ৮টার দিকে নারায়নগঞ্জ জেলা পুলিশ তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে মাদানীনগর মাদরাসায় প্রবেশের চেষ্টা করে। একই সঙ্গে ঢাকা থেকে একটি সাঁজোয়া যান ডেমরা হয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে। সাঁজোয়া যানের পিছনে ছিল বিপুল সংখ্যক র‍্যাব ও পুলিশ। বেলা ১১টা পর্যন্ত সাঁজোয়া যান নিয়ে যৌথ বাহিনী কয়েক দফা চেষ্টা করেও মাদরাসায় অভিযান চালাতে ব্যর্থ হয়।

এদিকে আল্লামা আহমদ শফিকে গ্রেফতার করা হয়েছে- এমন গুজব ছড়িয়ে পড়লে হাটহাজারী এলাকায় সড়ক অবরোধ করে হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীরা। এ সময় পুলিশ-হেফাজত ও আওয়ামীলীগের ত্রিমুখী সংঘর্ষে অন্তত ৭জন নিহত হন। একই খবর সারাদেশে ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন জেলায় সড়ক অবরোধ ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে।
বাগেরহাটের কয়েকটি পয়েন্টে সংঘর্ষে মারা যান আরো ২ হেফাজতকর্মী।

বেঁচে আসা কয়েকজনের বর্ণনা
ঢাকার কামরাঙ্গীরচর মাদরাসার ছাত্র মঈন জানান, অভিযানের সময় তিনি শাপলা চত্বর সংলগ্ন সোনালী ব্যাংকের পেছন দিকটায় সীমানা প্রাচীরের ভেতরে একটা বাগাড়ের মতো জায়গায় লুকিয়ে ছিলেন। বাইরে তখন ভারী অস্ত্রের গর্জন। ছোটাছুটি, চিৎকার। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে ছোট একটি জায়গায় শ'খানেক মানুষ
গাদাগাদি করে বসেছিলেন। ফজরের আজানের সময় তিনি ওখান থেকে বের

হয়ে যৌথবাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে বাসায় ফেরার চিন্তা করছিলেন। এ সময় একজন র‍্যাব সদস্য তাকে দেখে ফেলে। কিছুক্ষণ পর আরো দুইজন র‍্যাব সদস্য এসে তাকে বলে, আসেন, আপনাদের লোক নিয়ে যান। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তিনি আরো দুইজন সঙ্গীসহ ওই বাগাড় থেকে বেরিয়ে আসেন। বাইরে এসে তিনি সোনালী ব্যাংকের সিঁড়িতে ও সামনের ফুটপাতে গোটা অনেকগুলো রক্তাক্ত লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। র‍্যাবের নির্দেশে তিনি ওখান থেকে দুটি লাশ ভ্যানে তুলে দেন। ভয়ে তার পা টলছিলো, মাথা ঘুরছিলো। তিনি এক ফাঁকে কমলাপুর রোড দিয়ে কালেমা পড়তে পড়তে হাঁটতে
শুরু করেন। কিছুদূর যাওয়ার পর গুলিবিদ্ধ একজনকে জীবিত পড়ে থাকতে দেখেন। সে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার মিনতি করছিলো। তিনি রক্তাক্ত ওই মাদরাসা ছাত্রকে কাঁধে তুলে একটি সরু গলিতে প্রবেশ করেন। তখন একটা দুইটা রিকশা চলছিলো। তিনি রিকশা ডাকলে কোনো ড্রাইভারই এই রক্তাক্ত যাত্রী নিয়ে যেতে রাজি হয় নি। অনেক্ষণ পর একজন মুরব্বি বয়সের ড্রাইভার তাদের নিয়ে যেতে রাজি হয়।

ফরিদাবাদ মাদরাসার ছাত্র নোমান জানান, যৌথবাহিনীর অভিযানের সময় তিনি মতিঝিলে মোহামেডান ক্লাবের গলিতে ঢুকে পড়েন। সেখানে তার সাথে আরো পঞ্চাশ-ষাটজন লোক ছিলো। জায়গাটা একটা গলির ভিতরে থাকায় তারা সেটাকে নিরাপদ মনে করেছিলেন।
মেইন রোডে তখন কেয়ামতের বীভিষিকা চলছিলো। সাঁজোয়া যানের বিকট সাইরেন আর গুলির মুহুর্মুহু শব্দে আকাশ বাতাস কাঁপছিলো। স্বশস্ত্র সরকারদলীয় ক্যাডাররা পালাতে থাকা হেফাজত কর্মীদের বেধড়ক পেটাচ্ছিলো। এ সময় তারা একটি দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে আল্লাহ-রাসুলের নাম জপ করছিলেন। হঠাৎ পুলিশের টর্চের আলো এসে তাদের
ওপরে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে গুলিবর্ষণ শুরু হয়। তারা ওখান থেকে বেরিয়ে বঙ্গভবন এলাকা হয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। পেছন থেকে পুলিশ তাদের তাড়া করছিলো। নোমান জানান, সঙ্গে তার ছোট ভাইও ছিলো। তিনি ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে দৌড়াচ্ছিলেন। তখন তিনি রাস্তায় শত শত মানুষকে পড়ে থাকতে দেখেছেন। তাদের সাথে একজন ষাটোর্ধ্ব মুরব্বিও দৌড়াচ্ছিলেন। তার পা দিয়ে অবিরাম রক্ত ঝরছিলো। কিছুদূর যাওয়ার পর তিনি ফুটপাতে শুয়ে পড়েন। নোমান তাকে উঠাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ওই মুরব্বি কাতরাতে কাতরাতে তাকে বলেন, বাবা, আমার জন্য তোমার জীবনটা বিপন্ন করো না। তিনি একটু পানি খেতে চেয়েছিলেন, নোমান তাকে পানি দিতে পারেন নি।

ঢাকার রাস্তায় হেফাজত কর্মীদের উপর আক্রমণ করে পুলিশ। ৫ মে ২০১৩, ঢাকা। ছবি : সালমান মিয়া, *আলামি স্টক ফটো*

এরমধ্যে কয়েকজন পুলিশ এসে তাদেরকে ধরে ফেলে। একজন পুলিশ নোমানকে লাথি দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। আরেকজন তাকে অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে করতে লাঠি দিয়ে বেদড়ক পেটায়। নোমান লম্বা হয়ে মাটিতে পড়ে থাকেন। এ সময় একজন পুলিশ তার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করে। নোমান অন্ধকারে আত্মরক্ষার শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে বন্দুকের নল জোরে ধরে ধাক্কা দেন। গুলিটা তার কপালের পাশের চামড়া ও কানে লাগে। নোমান জ্ঞান হারান। পুলিশ তাকে মৃত ভেবে অন্ধকারে ফেলে যায়। জ্ঞান ফেরার পর তিনি আহত শরীর নিয়ে একটি বাড়ির সীমানাপ্রাচীরে প্রবেশ করেন বাড়িটির দারোয়ানের সহায়তায়। তখন তার পায়ের গুলিবিদ্ধ স্থান থেকে ও কপালের পাশ দিয়ে রক্ত ঝরছিলো। তার পরনের পাঞ্জাবী ছিড়ে দুটি জায়গায় বেন্ডেজ বেঁধে দেয় দারোয়ান। সকালে তিনি বঙ্গভবন এলাকা দিয়ে মাদরাসায় ফেরেন। তিনি যখন খুড়িয়ে খুড়িয়ে রাস্তা হাঁটছিলেন, বঙ্গভবন এলাকায় টহলরত কয়েকজন পুলিশের সাথে তার দেখা হয়। তারা তাকে তাচ্ছিল্য করতে থাকে। একজন পুলিশ তার সঙ্গী অন্য পুলিশদের বলে, 'কীরে, ও তো কাইল শহীদ হইতে গেছিলো, হইতে পারলো না, এখন ওরে শহীদ কইরা দে'। নোমান

জানান, ৬ তারিখ ভোর থেকে ফরিদাবাদ মাদরাসায় আহত রক্তাক্ত হেফাজতকর্মীরা আসতে থাকেন। এদের বেশিরভাগই গ্রাম থেকে এসেছিলেন। সকালে মাদরাসা মাঠ ও মসজিদের নীচতলা আহত হেফাজতকর্মীতে ভরে যায়। মাদরাসা মাঠেই মেডিক্যাল ক্যাম্প বসিয়ে তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তাদের সংখ্যা
ছিলো দুই থেকে তিনশো।

খিলগাঁও মাখজানুল উলুম মাদরাসার ছাত্র জসিম জানান, অভিযানের সময় তিনি শাপলা চত্বরের মূল মঞ্চের পাশে ছিলেন। গুলির আওয়াজে যখন চারদিক কম্পমান, অভিযানের সেই চরম মুহূর্তেও মঞ্চে জ্বালাময়ী বক্তৃতা চলছিলো। পুলিশকে গুলি না করতে অনুরোধ করা হচ্ছিলো। হঠাৎ মঞ্চে এসে দুটি সাউন্ড গ্রেনেড পড়লে বক্তৃতা বন্ধ হয়ে যায়। মঞ্চে যারা ছিলেন তারাও ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। এ সময় যৌথবাহিনীর একটি ট্যাংক সোজা মঞ্চের কাছে এসে দাঁড়ায়। ট্যাংকটি যখন মঞ্চের দিকে আসছিলো, তখন রাস্তায় অনেক মানুষ শোয়া ও বসা অবস্থায় ছিলেন। তাদের উপর দিয়েই ট্যাংক চলে আসে। জসিম জানান, তিনি তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনের রাস্তা দিয়ে পালাতে চেষ্টা করেন। হঠাৎ একটি গুলি এসে তার চোখে লাগে। এরপর তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। পরে তাকে কে বা কারা হাসপাতালে রেখে গেছে, তিনি তা বলতে পারেন না। জসিম আরো জানান, তার চোখটি আর ভালো হয়নি, নষ্ট হয়ে গেছে।

মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া এলাকার বাসিন্দা সালমান জানান, অভিযানের সময় তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনের
রাস্তা দিয়ে পালাবার সময় অবস্থা বেগতিক দেখে একটি ড্রেনের মধ্যে লুকিয়ে পড়েন। তার সঙ্গে আরো দশ-পনের জন ছিলো। হঠাৎ পুলিশের একটি দল এসে তাদের ওপর গুলি চালায়। তার কপালে, মাথায় ও চোখে গুলি লাগে। তিনি জ্ঞান হারান। সালমান জানান, তিনি পালিয়ে আসার সময় রাস্তায় শত শত মানুষকে পড়ে থাকতে দেখেছেন।

হাটহাজারী মাদরাসার ছাত্র মুহিম জানান, অভিযানের সময় তিনি মতিঝিল থানার সামনে ছিলেন। ওই দিক থেকে যখন যৌথবাহিনীর সাঁজোয়া যান আসছিলো, তারা তখন রোড ডিভাইডার ভেঙ্গে বাঁধ দিয়ে ও আগুন জ্বালিয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সে প্রতিরোধ বেশি সময় ধরে রাখতে পারেন নি।

হেফাজত কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় পুলিশ। ৫ মে ২০১৩, ঢাকা। ছবি : *আলামি স্টক ফটো*

শত শত মামলা : লক্ষাধিক আসামি

অভিযানের পরদিন হেফাজতের আমীর আহমদ শফীকে হাটহাজারী পাঠিয়ে দেয় সরকার। মহাসচিব জুনায়েদ বাবুনগরীকে লালবাগ থেকে গ্রেফতার করে ৩১ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে হত্যা, লুঠপাট, অগ্নিসংযোগ, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা, সরকারি কাজে বাধা দেওয়া ইত্যাদি অভিযোগে সারাদেশে শত শত মামলা দায়ের করা হয়। মহাসচিব জুনায়েদ বাবুনগরী ও কেন্দ্রীয় নেতাদের বিরুদ্ধে শুধু রাজধানীর বিভিন্ন থানায় ৪৬টি মামলা দায়ের করে পুলিশ। এসব মামলায় আসামী করা হয় লক্ষাধিক।

হেফাজতের সংবাদ সম্মেলন

৭ মে বিকেলে হাটহাজারীতে সংবাদ সম্মেলন করে হেফাজতে ইসলামের পক্ষ থেকে বলা হয়, আলেমসমাজ ইতিহাসের এক নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছেন। এমন নিষ্ঠুরতম হত্যাকান্ড বাংলাদেশের ইতিহাসে আর হয়েছে বলে কারো জানা নেই। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, এমন এক সময় আমরা কথা বলছি, যখন এদেশের নিরিহ আলেম-ওলামা ও ধর্মপ্রাণ মানুষের রক্তের দাগ রাজপথে লেগে আছে। লাশ পড়ে আছে হাসপাতালের মর্গে ও অজানা স্থানে। আল্লাহ ও রাসুলের ভালোবাসার টানে ঘর থেকে বের হওয়া হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ

মানুষ এখনো ঘরে ফেরেন নি। তারা কোথায় আছেন, কী অবস্থায় আছেন, জীবিত আছেন কি মৃত, কেউ জানে না। এক চরম বিভীষিকাময় পরিস্থিতি অতিক্রম করছে দেশ। এমন ভয়াবহ চিত্র যুদ্ধাবস্থাকেও হার মানিয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, সরকার শাপলা চত্বরে ৫ মে দিবাগত রাতের আঁধারে ঘুমন্ত ও জিকিররত আলেম-ওলামা ও ধর্মপ্রাণ মানুষের উপর নৃশংস, নির্মম, বর্বর ও অমানবিক হত্যাকান্ড চালিয়েছে। সেখানে কতজন লোককে শহীদ করা হয়েছে, সেই পরিসংখ্যান যাতে বের হতে না পারে, সে জন্য হত্যাকান্ডের সঙ্গে সঙ্গে ট্রাকভর্তি লাশ গুম করা হয়েছে। সেখান থেকে দ্রুত আলামত সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

‘৫ মে দুপুর থেকে গুলিস্তান, পল্টন, বায়তুল মোকাররম, বিজয়নগর ও দৈনিক বাংলা মোড় এলাকায় বিনা উস্কানিতে শাপলা চত্বরগামী মিছিলের ওপর হামলা চালায় সরকারদলীয় ক্যাডার ও পুলিশ। সরাসরি গুলিবর্ষণ করে অজ্ঞাতসংখ্যক লোককে হত্যা ও আহত করা হয়েছে। পুলিশ ও ক্ষমতাসীন দলের লোকেরা

ঢাকায় প্রবেশের পথে সকালে সর্বপ্রথম গুলিস্তানের মহানগর নাট্যমঞ্চের কাছে হেফাজতের নেতাকর্মীদের গতি রোধ করে তাদের ওপর গুলি চালায়। পরে দৈনিক বাংলা থেকে পল্টন, তোপখানা, গুলিস্তান, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ পর্যন্ত মিছিলে আক্রমণ করতে থাকে।'

'একদিকে শাপলা চত্বরে আমাদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশ চলছিলো, অন্যদিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সরকারি দলের সন্ত্রাসীদের সঙ্গে নিয়ে সমাবেশে আসতে থাকা হেফাজতের কর্মীদের ওপর হামলা অব্যাহত রাখে। দুপুর থেকে রাত পুরো এলাকায় পুলিশ পাখির মতো গুলি করে হেফাজতকর্মীদের হত্যা করতে থাকে। অন্যদিকে সরকারি দলের সন্ত্রাসীরা কখনো স্বরূপে কখনো হেফাজতের কর্মী সেজে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করতে থাকে।'

'আমরা শান্তিপূর্ণ অবস্থানের ঘোষণা দিয়ে সরকারকে অন্য প্রান্তে হত্যাকান্ড বন্ধের আহবান জানাই। কিন্তু আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও সরকারি দলের সন্ত্রাসীরা সন্ধ্যার পর আরও ভয়াবহ ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, যে করেই হোক সকালে দোয়ার মাধ্যমে সমাবেশ শেষ করে দেব। আমাদের ইচ্ছার কথা প্রশাসনের লোকজনকেও বারবার অবহিত করা হয়। কিন্তু আমাদের কোনো কথায় কর্ণপাত না করে সরকার নজিরবিহীন আগাসী তৎপরতার মাধ্যমে পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞ চালায়।

শহীদ পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আহবান আহমদ শফির

১০ মে হেফাজতে ইসলামের আমীর আল্লামা শাহ আহমদ শফি দেশবাসীকে শহীদ পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আহবান জানান। ওই দিন হাটহাজারীতে শাপলা চত্বরে নিহতদের স্মরণে আয়োজিত দোয়া মাহফিল ছিল। এ সময় তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ, গত কয়েকদিনে দেশের হাজার হাজার আলেম, মাদরাসা ছাত্র ও তৌহিদি জনতার মা-বাবা সন্তানহারা হয়েছেন। স্ত্রীরা স্বামীহারা হয়েছেন। সন্তানেরা বাবাহারা হয়েছেন। আল্লাহ, আপনি তাদের পরিবারের সবাইকে ধৈর্য ধারনের শক্তি দান করুন। আহতদেরকে দ্রুত আরোগ্য দান করুন। আপনার জমিনে আপনার দ্বীনকে কায়েম করুন।'

এ সময় মোনাজাতরত হাজার হাজার আলেম ওলামার মধ্যে কান্নার রোল পড়ে যায়। আল্লামা শফি মোনাজাত-পূর্ব বক্তৃতায় ঈমাম আকিদা রক্ষার চলমান আন্দোলনে যারা নির্দয়ভাবে শহীদ হয়েছেন, যারা জুলুম অত্যাচারের শিকার হয়ে আহত হয়েছেন, তাদের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াতে সকলের প্রতি আহবান জানান। তিনি শহীদদের আত্মার মাগফিরাত ও তাদের পরিবারের সদস্যদের ধৈর্য ধারণের জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেন। আধা ঘন্টা ব্যাপি

এ বিশেষ মোনাজাতে আল্লামা শফি হৃদয়ের গভীর আকুতি নিয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানিয়ে বলেন, 'হে আল্লাহ, আমরা নিরীহ আলেমসমাজ মাদরাসা ছাত্রসহ লক্ষ তৌহিদি জনতা আপনার দ্বীন ইসলামের অবমাননা বন্ধ করার দাবিতে, আপনার রাসুল (স.) এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা বন্ধ করার দাবিতে, আপনার নাজিলকৃত পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে কথা বলা বন্ধ করার দাবিতে এবং আপনার নাজিলকৃত পবিত্র ধর্ম ইসলামের ইজ্জত রক্ষার দাবিতে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছিলাম। আপনার নির্দেশনামতো ঈমান আকিদা রক্ষার জন্য কিছু দাবি দাওয়া নিয়ে রাস্তায় নেমেছিলাম। আমাদের উপর ভয়াবহ জুলুম অত্যাচার করা হয়েছে। নিরীহ আলেমদের শহীদ করা হয়েছে। পঙ্গু করা হয়েছে। হে আল্লাহ, এই অন্যায় জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপনার গায়েবী মদদ কামনা করছি। আপনি এই দেশ ও জাতিকে জুলুম অত্যাচার থেকে রক্ষা করুন।'

শেষ কথা

শাপলা চত্বরের ঘটনা এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের হৃদয়ে যে রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে, ধর্মপ্রাণ মানুষের আত্মমর্যাদাকে যেভাবে ভুলুণ্ঠিত করেছে, মানুষের অন্তরে যে জ্বালা তৈরি করেছে, তা সহজে জুড়াবার নয়। রাসুল অবমাননার প্রতিবাদ করতে এসে যে মানুষগুলো নৃশংসতার শিকার হয়েছে, রক্ত দিয়েছে, তারা এ স্মৃতি সহজে ভুলবে না। শাপলা চত্বর তাদের কাছে তাই গৌরবের ও যন্ত্রণার, বেদনার ও দীর্ঘশ্বাসের।

শাপলা চত্বরে আক্রান্ত বাংলাদেশের দুঃখী মানুষগুলির হৃদয়ের জ্বালা না জুড়িয়ে ইতিহাস এগোবে না। মনে রাখতে হবে, ৫ মে দুপুর থেকে ৬ মে ভোর রাত পর্যন্ত শাপলা চত্বরে ও পরদিন দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারি বাহিনীর হাতে যারা মারা পড়েছে, নিখোঁজ হয়েছে, রক্ত দিয়েছে, তাদের বাড়ি কিন্তু মঙ্গলগ্রহে নয়, এরা এদেশেরই সন্তান। যেসব গ্রাম-মহল্লা থেকে এরা রাজধানীতে এসেছিলো, সেসব জায়গায়ও সমাজবদ্ধ মানুষ বাস করে। আজ না হোক কাল তারা লাশের সন্ধান চাইবে, খুনের বিচার চাইবে, রক্তের মূল্য চাইবে। তাদের সাথে চারদিক থেকে ধেয়ে আসবে লাখো জনতার রুদ্ররোষের মিছিল। কবর ও ভাগাড় থেকে অসংখ্য আলেমে দ্বীনের হাড়গোড় ও হাজারো মজলুমের আহাজারি অসংখ্য কফিন হয়ে সেই মিছিলে যোগ দেবে। সেই মিছিল ঠেকানোর সাধ্য কি ৬ মে'র বরপুত্রদের আছে?